।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ ।।

।। অথাষ্টদশোঽধ্যায়ঃ ।।

এটাই গীতাশাস্ত্রের শেষ অধ্যায়। এই অধ্যাযের পূর্বার্দ্ধে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অনেক প্রশ্নের সমাধান এবং উত্তরার্দ্ধ গীতাশাস্ত্রের উপসংহার, যাতে এই শাস্ত্রাধ্যয়ন থেকে কি লাভ হয় ? সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে আহার, তপস্যা, যজ্ঞ, দান এবং শ্রদ্ধাকে বিভাগ করে তাদের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সন্দর্ভে ত্যাগের স্বরূপ হল সেই আলোচ্য বিষয়বস্তু। মানুষ কি কারণে কর্ম করে ? কে কর্ম করান—ভগবান অথবা প্রকৃতি ? এই প্রশ্নগুলি পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, যেগুলির উপর বর্তমান অধ্যায়ে পুনরায় আলোকপাত করা হয়েছে। এইরূপ পূর্বে বর্ণব্যবস্থার চর্চাও করা হয়েছে। প্রস্তুত অধ্যায়ে বর্ণব্যবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধেই বিশদ বিবরণ দেওযা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে এর স্বরূপ-এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শেষে গীতা থেকে কি কি বিভূতিলাভ হয় ?—তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

সপ্তদশ অধ্যায়ে বহু প্রকরণের বিভাজন শুনে শেষে সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব জানবার জন্য প্রস্তুত অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করলেন—

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।

ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্কেশিনিষূদন।।১।।

অর্জুন বললেন— হে মহাবাহো !, হে হৃদয়ের সর্বস্ব !, হে কেশিনিষূদন ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের যথার্থ স্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জানতে চাই। পূর্ণ ত্যাগই সন্ন্যাস, যখন সঙ্কল্প ও সংস্কার উভয়েরই বিলুপ্তি ঘটে। এর পূর্বে সাধনার পূর্তির জন্য উত্তরোত্তর আসক্তির ত্যাগ করাই ত্যাগ। এখানে প্রশ্ন দুটি— সন্ন্যাস তত্ত্বকে এবং ত্যাগ তত্ত্বকে জানতে চাই। এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।।২।।

অর্জুন! কাম্য কর্মের পরিত্যাগকেই পণ্ডিতগণের কেউ কেউ সন্ন্যাস বলেন এবং কিছু বিচারকুশল পুরুষগণ সম্পূর্ণ কর্মফলের ত্যাগকে ত্যাগ বলেন।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে।।৩।।

কিছু বিদ্বানগণ এইরূপ বলেন যে, সকল কর্ম দোষযুক্ত অতএব ত্যাগ করা উচিত। অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কারও ত্যাগ করা উচিত নয়। এইরূপ বহু মত প্রস্তুত করার পর যোগেশ্বর নিজের নিশ্চিত মতটি দিলেন–

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ।।৪।।

হে অর্জুন! সেই ত্যাগবিষয়ে আমার নিশ্চয় শোন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই ত্যাগ তিন প্রকারের বলা হয়েছে।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।।৫।।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাজ্য যোগ্য নয়। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করা উচিত, কারণ এই তিনটি মানুষকে পবিত্র করে।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে চারটি প্রচলিত মতের উল্লেখ করলেন। প্রথম–কাম্যকর্মের ত্যাগ, দ্বিতীয়–সম্পূর্ণ কর্মফলের ত্যাগ, তৃতীয়–দোষযুক্ত হওয়ার জন্য সকল কর্মের ত্যাগ ও চতুর্থ–যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নয়। চারটির মধ্যে একটি মতে নিজের অভিমত দিলেন যে, অর্জুন! আমারও এই সুনিশ্চিত মত যে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নয়। এর থেকে প্রমাণিত হল যে, কৃষ্ণকালেও কয়েকটিই মত প্রচলিত ছিল, যেগুলির মধ্যে যথার্থটিও ছিল। সেই সময়েও নানা মত ছিল, আজও আছে। যখন কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তখন মত-

মতান্তরের মধ্যে থেকে কল্যাণকর মতটিকে জনসাধারণের মধ্যে প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক মহাপুরুষ করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাই করেছেন। তিনি কোন নতুন পথ দেখাননি, বরং প্রচলিত মতগুলির মধ্য থেকে সত্যকে সমর্থন করে তা স্পষ্ট করেছেন।

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।।৬।।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জোর দিয়ে বললেন—পার্থ! যজ্ঞ, দান ও তপস্যাররূপ কর্ম আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে অবশ্য কর্তব্য। এই আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত। এখন অর্জুনের জিজ্ঞাসা অনুসারে তিনি ত্যাগের বিশ্লেষণ করলেন—

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।

মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ।।৭।।

হে অর্জুন! নিয়ত কর্ম (শ্রীকৃষ্ণের মতে নিয়ত কর্ম একটাই, যজ্ঞের প্রক্রিয়া। এই 'নিয়ত' শব্দটি যোগেশ্বর আট-দশবার উচ্চারণ করেছেন। এর উপর বার বার জোর দিয়েছেন, যাতে সাধক ভ্রান্ত হয়ে অন্য কোন কাজকে কর্ম মনে করে করতে শুরু না করে দেন), এই শাস্ত্রবিধিদ্বারা নির্ধারিত কর্মের ত্যাগ করা উচিত নয়। মোহগ্রস্ত হয়ে তার ত্যাগ করাকে তামসিক ত্যাগ বলা হয়েছে। সাংসারিক বিষয়বস্তুর আসক্তিতে জড়িয়ে কার্যম্ কর্ম (কার্যম্ কর্ম, নিয়ত কর্ম একে অন্যের পূরক)-এর ত্যাগ তামসিক ত্যাগ। এইরূপ পুরুষ **'অধঃ গচ্ছতি'** কীট-পতঙ্গপর্যন্ত অধম যোনিতে জন্ম নেয়; কারণ সে ভজনের প্রবৃত্তি ত্যাগ করেছে। এখন রাজসিক ত্যাগের বিষয়ে বলছেন—

দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।

স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ।।৮।।

কর্ম দুঃখকর মনে করে যিনি দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্মত্যাগ করেন, তিনি এই রাজসিক ত্যাগ করেও ত্যাগের ফললাভ করতে পারেন না। যিনি ভজন সম্পূর্ণ করতে পারেন না ও **'কায়ক্লেশভয়াৎ'**— দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্মত্যাগ করেন, সেই ব্যক্তির ত্যাগ রাজসিক, তিনি ত্যাগের ফল পরমশান্তি লাভ করতে পারেন না।

কার্যমিত্যেব যৎকর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন।

সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ।।৯।।

হে অর্জুন ! 'করা কর্তব্য'- এইরূপ বিবেচনা করে যে '**নিয়তম্**'—শাস্ত্রবিধিদ্বারা নির্ধারিত কর্ম, সঙ্গদোষ ও ফলকামনা ত্যাগ করে করা হয়, সেই ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। অতএব নিয়ত কর্ম করুন এবং তা ভিন্ন সমস্তই ত্যাগ করুন। এই নিয়ত কর্ম কি সর্বদা করতে হবে অথবা কখনও এই কর্মও সম্পূর্ণ হবে ? এই প্রসঙ্গে বলছেন, (এখন ত্যাগের শেষ রূপ দেখুন)—

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।

ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ।।১০।।

হে অর্জুন ! যিনি '**অকুশলং কর্ম**' অর্থাৎ অকল্যাণকর কর্মে (শাস্ত্র নিয়ত কর্মই কল্যাণকর। এর বিপরীত যা কিছু করা হয, তা এই লোকের বন্ধন সেইজন্য অকল্যাণকর, এইরূপ কর্মে) দ্বেষ করেন না ও কল্যাণকর কর্মে আসক্ত হন না, যা কর্তব্য কর্ম ছিল তাও অসম্পূর্ণ নেই—এইরূপ সত্ত্বসংযুক্ত পুরুষ সংশয়মুক্ত, জ্ঞানী ও ত্যাগী হন। কারণ তিনি সর্বকর্মের ত্যাগ করেছেন, কিন্তু ভগবৎ প্রাপ্তির সঙ্গে পূর্ণ ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। এর থেকেও সরল পথ আছে কি ? তিনি বলেছেন—না। দেখুন—

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।

যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।।১১।।

দেহধারী পুরুষগণ (কেবল দেহটাই নয়, যেটা আপনার চোখে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে প্রকৃতিজাত সত্ত্ব-রজঃ-তম এই তিনটি গুণই জীবাত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে। যতক্ষণ গুণ সক্রিয়, ততক্ষণ দেহ ধারণ করতে হয়। দেহধারণের কারণ গুণত্রয় যতক্ষণ সক্রিয়, ততক্ষণ কোন না কোন রূপে দেহের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে।) নিঃশেষরূপে সকলকর্ম ত্যাগ করতে পারেন না, সেইজন্য যিনি কর্মফলের কামনাত্যাগ করেছেন, তিনিই ত্যাগী—এইরূপ বলা হয়। অতএব যতক্ষণ দেহ ধারণের কারণ বর্তমান, ততক্ষণ তিনি কর্মের অনুষ্ঠান করুন এবং ফলের কামনা ত্যাগ করুন। কিন্তু সকামী ব্যক্তিগণও কর্মের ফললাভ করে থাকেন।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্কচিৎ।।১২।।

ভাল, মন্দ ও মিশ্রিত—এই তিন প্রকার ফল সকামী ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পরেও লাভ করে, জন্ম-জন্মান্তরপর্যন্ত ভোগ করে; কিন্তু 'সন্ন্যাসিনাম্'— সর্বস্বের ন্যাস (শেষ) করেছেন যে পূর্ণত্যাগী পুরুষগণ, তাঁরা কোন কর্মফল ভোগ করেন না। একেই বলে শুদ্ধ সন্ন্যাস। সন্ন্যাস হল চরমোৎকর্ষের অবস্থা। ভাল, মন্দ কর্মগুলির ফল এবং পূর্ণ ন্যাসকালে সেগুলির সমাপ্তির প্রশ্ন এখানেই সম্পূর্ণ হল। কি কারণে মানুষ শুভ অথবা অশুভ কর্ম করে? এই প্রসঙ্গে দেখুন—

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।

সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্।।১৩।।

হে মহাবাহো! সাংখ্য-সিদ্ধান্তে সর্বকর্ম সম্পাদনের পাঁচটি কারণ নিরূপিত হয়েছে। এইগুলি আমার কাছে অবগত হও।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।

বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্।।১৪।।

এই বিষয়ে কর্তা (এই মন), পৃথক্ পৃথক্ করণ (যাদের সাহায্যে কর্ম করা হয়—বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, ত্যাগ, অনবরত চিন্তনের প্রবৃত্তিগুলি শুভকর্ম সম্পাদনের করণ হয় এবং কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ, লিপ্সা ইত্যাদি অশুভ কর্ম সম্পাদনের করণ হয়।), বিভিন্ন প্রকারের চেষ্টা (অনন্ত ইচ্ছা), আধার (অর্থাৎ সাধন, যে ইচ্ছার সঙ্গে সাধন জোটে, সেই ইচ্ছা পূর্ণ হতে শুরু করে) এবং পঞ্চম হেতু দৈব অথবা সংস্কার। এর-ই পুষ্টি করে-

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎকর্ম প্রারভতে নরঃ।

ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ।।১৫।।

শরীর, মন এবং বাক্য দ্বারা মানুষ শাস্ত্রের অনুসারে অথবা বিপরীত যে কর্ম করে, সেই সমস্ত কর্মের কারণ এই পাঁচটি। পরন্তু এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও—

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ।।১৬।।

যিনি অশুদ্ধ বুদ্ধি হেতু সেই বিষয়ে কৈবল্য স্বরূপ আত্মাকে কর্তা বলে মনে করেন, সেই ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তি যথার্থদর্শী নন অর্থাৎ ভগবান করেন না।

এই প্রশ্নের উপর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় জোর দিলেন। পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন, প্রভু স্বয়ং করেন না, করান না এবং ক্রিয়ার সংযোগও করিয়ে দেন না। তবে লোকে বলে কেন? তাদের বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন, সেজন্য তারা যা ইচ্ছা তা ই বলতে পারেন। এখানেও বলছেন—সমস্ত কর্মের কারণ পাঁচটি। এর পরেও যাঁরা কৈবল্য স্বরূপ পরমাত্মাকে কর্তা বলে মনে করেন, সেই মূঢ়গণ যথার্থদর্শী নন অর্থাৎ ভগবান করেন না, পরন্তু ভগবান অর্জুনকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন, '**নিমিত্তমাত্রং ভব**' যে, হর্তা-কর্তা তো আমি, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। তাহলে তিনি বলতে চাইছেন কি?

বস্তুতঃ ভগবান ও প্রকৃতির মাঝে একটা আকর্ষণ রেখা আছে। যতক্ষণ সাধক প্রকৃতির সীমার মধ্যে থাকেন, ভগবান তাঁর জন্য কিছু করেন না। অতি কাছে থেকে ঈশ্বর কেবল দ্রষ্টা-রূপেই থাকেন। অনন্যভাবে ইষ্টের আশ্রিত হলে তিনি সাধকের হৃদয়-দেশ-এ সঞ্চালক হয়ে যান। তখনই সাধক প্রকৃতির আকর্ষণ সীমা পার করে ঈশ্বরীয় ক্ষেত্রে চলে যান। এইরূপ অনুরাগীকে সাহায্য কবরার জন্য ঈশ্বর সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। কেবল এইরূপ অনুরাগীর জন্যই ভগবান করেন। অতএব চিন্তন করুন। প্রশ্নটি সম্পূর্ণ হল। আরও দেখুন—

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।

হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে।।১৭।।

'আমি কর্তা'—এই ভাব যাঁর নেই এবং যাঁর বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোকের সংহার করলেও সংহর্তা হন না বা আবদ্ধ হন না। লোক-সম্বন্ধী সংস্কারের বিলয়কেই লোক-সংহার বলা হয়। কিরূপে সেই নিয়ত কর্মের প্রেরণা লাভ হয়? এই প্রসঙ্গে দেখুন—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।

করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসঙ্গ্রহঃ।।১৮।।

অর্জুন! পরিজ্ঞাতা অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞাতা মহাপুরুষগণ দ্বারা, **'জ্ঞানং'**- তাঁকে অবগত হবার বিধিদ্বারা এবং **'জ্ঞেয়ম্'**—জানবার যোগ্য বস্তু (শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলেছেন আমিই জ্ঞেয়, জানবার যোগ্য) দ্বারা কর্ম করার প্রেরণালাভ হয়। পূর্ণজ্ঞাতা মহাপুরুষের কাছে সেই জ্ঞান-সম্বন্ধে জানার বিধিলাভ হলে, জ্ঞেয়—লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি থাকলে তবেই কর্মের প্রেরণা পাওয়া যায় এবং কর্তা (মনের নিষ্ঠা), করণ (বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম ইত্যাদি) এবং কর্মের স্বরূপ অবগত হলে কর্ম সঞ্চয় হয়। পূর্বে বলা হয়েছিল যে, প্রাপ্তির পরে কর্ম করবার দরকার হয় না ও কর্মত্যাগ করলে কোন লোকসানও হয় না; তা সত্ত্বেও লোকসংগ্রহ অর্থাৎ অনুগামীদের হৃদয়ে কল্যাণকর সাধনের সংগ্রহের জন্য তিনি কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন। কর্তা, করণ এবং কর্মদ্বারা এগুলি সংগ্রহ হয়। জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা তিন প্রকারের হয়—

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।

প্রোচ্যতে গুণসঙ্খ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি।।১৯।।

সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা গুণভেদে তিন প্রকার বলা হয়েছে, সেই সকল তুমি যথাযথরূপে শ্রবণ কর। প্রথমে প্রস্তুত জ্ঞানের ভেদ—

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।।২০।।

অর্জুন! যে জ্ঞানদ্বারা মানুষ পৃথক্ পৃথক্ সকলভূতে এক অবিনাশী পরমাত্মভাবকে অবিভক্ত সমভাবে স্থিত দেখেন, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে। জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ অনুভূতি, এই অনুভূতির সঙ্গে-সঙ্গেই ত্রিগুণ শান্ত হয়ে যায়। এটাই জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থা। এখন রাজসিক জ্ঞান দেখুন—

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্পৃথগ্বিধান্।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্।।২১।।

যে জ্ঞানদ্বারা সর্বভূতে ভিন্নভিন্ন বহুভাবকে পৃথকভাবে জানা যায় যে, ইনি ভাল, ইনি মন্দ—সেই জ্ঞানকে তুমি রাজসিক বলে জানবে। এইরূপ স্থিতিতে যিনি আছেন, তাঁর জ্ঞান রাজসিক স্তরের। এখন দেখুন তামসিক জ্ঞান—

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্কার্যে সক্তমহৈতুকম্।

অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্।।২২।।

যে জ্ঞানদ্বারা কোন একটি দেহে সম্পূর্ণ আত্মা আছেন—এইরূপ অভিনিবেশ হয়, সেই অযৌক্তিক অর্থাৎ যার পিছনে কোন ক্রিয়া নেই, তত্ত্বের অর্থস্বরূপ পরমাত্মা থেকে পৃথক করে এবং তুচ্ছ, সেইজন্য সেই জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে। এখন প্রস্তুত কর্মের তিনটি ভেদ—

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।

অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎসাত্ত্বিকমুচ্যতে।।২৩।।

যে কর্ম '**নিয়তম্**'—শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত, সঙ্গদোষ ও ফলাভিলাষরহিত পুরুষদ্বারা রাগ ও দ্বেষবর্জনপূর্বক করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে। নিয়ত কর্ম (আরাধনা) চিন্তনকে বলা হয়, যে চিন্তন পরম-এ স্থিতি প্রদান করে।)

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্।।২৪।।

ফলকামনাযুক্ত ও অহংকারযুক্ত হয়ে বহু কষ্টসাধ্য যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয় সেই সকল কর্মকে রাজসিক কর্ম বলা হয়। এই রাজস পুরুষও সেই নিয়ত কর্ম করেন; কিন্তু পার্থক্য এই যে, ফলকামনা করে ও অহঙ্কারযুক্ত সেইজন্য তার দ্বারা যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে রাজসিক কর্ম বলে। এখন দেখুন—

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।

মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে।।২৫।।

যে কর্ম শেষে নষ্ট হয়ে যায়, হিংসা-সামর্থ্যের বিচার না করে কেবল মোহবশ আরংভ করা হয়, তা তামসিক কর্ম বলে উক্ত হয়। স্পষ্ট হল যে, এই কর্ম শাস্ত্রের

নিয়ত কর্ম নয়। শাস্ত্রের জায়গাতে ভ্রান্ত ধারণাকে আশ্রয় করা হয়েছে। এখন দেখুন কর্তার লক্ষণ—

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।।২৬।।

যিনি সঙ্গদোষমুক্ত, অহংবাদী নন, ধৃতিশীল ও উদ্যমযুক্ত, ক্রিয়মাণ কর্মের সিদ্ধিতে হর্ষহীন এবং অসিদ্ধিতে বিষাদশূণ্য, বিকারগুলি থেকে মুক্ত হয়ে কর্মে (অহর্নিশ) প্রবৃত্ত, সেই কর্তাকে সাত্ত্বিক বলা হয়। এগুলি উত্তম সাধকের লক্ষণ। কর্ম সেই একটাই—নিয়ত কর্ম।

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ।।২৭।।

আসক্তিযুক্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোলুপ, পরপীড়ক, অপবিত্র এবং হর্ষ-শোকে যিনি লিপ্ত, সেই কর্তাকে রাজসিক কর্তা বলা হয়।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠোঽনৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে।।২৮।।

চঞ্চল চিত্ত, অসংস্কৃত বুদ্ধি, অনম্র, বঞ্চক, পরবৃত্তিচ্ছেদনকারী, কর্তব্যে প্রবৃত্তিহীন, সদা অবসন্ন স্বভাব ও দীর্ঘসূত্রী সেই কর্তাকে তামসিক কর্তা বলা হয়। যারা দীর্ঘসূত্রী তারা কর্মকে 'কাল করা যাবে' বলে অসম্পূর্ণ রাখে, যদিও তার অন্তরে কর্ম করার ইচ্ছা থাকে। এইরূপ কর্তার লক্ষণ সম্পূর্ণ হল। এখন যোগেশ্বর এক নতুন প্রশ্ন সম্বন্ধে বলছেন বুদ্ধি, ধারণা ও সুখের লক্ষণ—

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়।।২৯।।

ধনঞ্জয়! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিনপ্রকার ভেদ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলছি, শ্রবণ কর।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩০।।

পার্থ! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয় ও অভয় এবং বন্ধন ও মোক্ষ—এই সকল বিষয় যে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায়, তা সাত্ত্বিক বুদ্ধি। অর্থাৎ পরমাত্ম-পথ, গমনাগমন পথ উভয়েরই উত্তমপ্রকার জ্ঞানকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলে। যথা—

যয়া ধর্মমধর্মং চ কার্যং চাকার্যমেব চ।

অযথাবৎপ্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩১।।

পার্থ! যে বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম ও অধর্ম এবং কর্ত্য ও অকর্তব্য যথাযথরূপে জানতে পারা যায় না, তা রাজসিক বুদ্ধি। এখন তামসিক বুদ্ধির স্বরূপ দেখুন—

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।

সর্বার্থান্বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।।৩২।।

পার্থ! যে বুদ্ধি তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সকল বিষয় বিপরীতভাবে বোঝে, তা তামসিক বুদ্ধি।

এখানে শ্লোকসংখ্যা ত্রিশ থেকে বত্রিশপর্যন্ত বুদ্ধির তিনটি ভেদ বলা হয়েছে। প্রথমে বুদ্ধি কোন কাজ থেকে নিবৃত্ত হবে এবং কোন কাজে প্রবৃত্ত হবে, কর্তব্য কি ও অকর্তব্য কি— যে বুদ্ধি উত্তমরূপে এইগুলি সম্বন্ধে অবগত, সেই বুদ্ধিই সাত্ত্বিকী। যে বুদ্ধি কর্তব্য-অকর্তব্যকে অস্পষ্টভাবে জানে, যথার্থ জানে না, সেই বুদ্ধি রাজসিক এবং অধর্মকে ধর্ম, নশ্বরকে শাশ্বত এবং হিতে অহিত-এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি তামসিক বুদ্ধি। এইভাবে বুদ্ধির ভেদ সম্পূর্ণ হল। এখন প্রস্তুত অন্য প্রশ্ন 'ধৃতি'—ধারণার তিন ভেদ—

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩৩।।

'**যোগেন**'—যৌগিক প্রক্রিয়া দ্বারা '**অব্যভিচারিণী**'—যোগ-চিন্তন ব্যতীত অন্য কোন চিন্তন ব্যভিচার, চিত্ত বিচলিত হওয়া ব্যভিচার, অতএব এইরূপ অব্যভিচারিণী ধৃতিদ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ শাস্ত্রমার্গে বিধৃত হয়, এই প্রকার ধৃতিই সাত্ত্বিকী। অর্থাৎ মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ইষ্টোন্মুখ করা সাত্ত্বিকী ধারণা। এবং—

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ধৃত্যা ধারয়তেহর্জুন।

প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩৪।।

হে পার্থ! ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে যে ধৃতিদ্বারা কেবল ধর্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করে থাকে (মোক্ষ নয়) তা রাজসিক ধৃতি। এই ধৃতিতেও লক্ষ্য সেই একই, এতে কেবল কামনা করা হয়। যা কিছু কার্য করে, তার পরিবর্তে ফল পেতে চায়। এখন তামসিক ধৃতির লক্ষণ দেখুন–

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।

ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী।।৩৫।।

হে পার্থ! দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি যে ধৃতিদ্বারা নিদ্রা, ভয়, চিন্তা, দুঃখ ও অভিমান পরিত্যাগ করে না, তাদের ধারণ করে থাকে, তা তামসিক ধৃতি। এই প্রশ্নটি সম্পূর্ণ হল। পরের প্রশ্নটি সুখ–

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি।।৩৬।।

অর্জুন! এখন আমার কাছে ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। তাদের মধ্যে যে সুখে সাধক অভ্যাসবশতঃ রমণ করে অর্থাৎ চিত্ত সংযম করে ইষ্টে রমণ করে এবং যা দুঃখ থেকে মুক্ত করে। এবং–

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্।

তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্।।৩৭।।

উপর্যুক্ত সুখ সাধনের আরম্ভকালে যদিও বিষতুল্য। (প্রহ্লাদকে শূলে চড়ানো হয়েছিল, মীরাকে বিষ দেওয়া হয়েছিল। কবীর বলেছেন–'**সুখিয়া সব সংসার হ্যায়, খায়ে অওর সোয়ে। দুখিয়া দাস কবীর হ্যায়, জাগে অউর রোয়ে।**' অতএব আরম্ভে বিষতুল্য।) কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য, অমৃততত্ত্ব প্রদান করে। অতএব আত্ম-বিষয়ক বুদ্ধির নির্মলতা থেকে উৎপন্ন সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলা হয়। এবং–

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্।

পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্।।৩৮।।

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থেকে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তা ভোগকালে যদিও অমৃততুল্য কিন্তু পরিশেষে বিষতুল্য; কারণ এই সুখ জন্ম-মৃত্যুর কারণ, সেই সুখকে রাজসিক সুখ বলা হয়। এবং–

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।

নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্‌।।৩৯।।

যে সুখ ভোগকালে ও পরিণামে আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে, নিদ্রা **'যা নিশা সর্বভূতানাং'**- জগৎরূপ নিশাতে অচৈতন্য করে রাখে, আলস্য ও ব্যর্থ চেষ্টা থেকে উৎপন্ন সেই সুখকে তামসিক সুখ বলা হয়। এখন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণ সম্বন্ধে বলছেন, সকলের সঙ্গেই যেগুলির সম্পর্ক আছে–

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎত্রিভির্গুণৈঃ।।৪০।।

অর্জুন! পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবতাদের মধ্যে এমন কোন প্রাণী নেই, যে এই প্রকৃতিজাত ত্রিগুণ থেকে মুক্ত। অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে শুরু করে কীট-পতঙ্গপর্যন্ত সম্পূর্ণ জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, জন্ম-মৃত্যুশীল, ত্রিগুণের অন্তর্ভুত অর্থাৎ দেবতাও ত্রিগুণের বিকারকেই বলে; দেবতাও নশ্বর।

এখানে বাহ্য দেবতাগণের যোগেশ্বর চতুর্থবার উল্লেখ করলেন। প্রথমে সপ্তম অধ্যায়ে তারপর নবম, সপ্তদশ এবং এখানে অষ্টাদশ অধ্যায়ে। এরগুলির অর্থ এই থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে দেবগণও ত্রিগুণের অন্তর্ভুত। যাঁরা এদের পূজা করেন, তাঁরা নশ্বরকে পূজা করেন।

ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে মহর্ষি শুক এবং পরীক্ষিত প্রসিদ্ধ আখ্যান আছে। এখানে তাঁরা পরীক্ষিতকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পরস্পর প্রেমের সম্পর্কের জন্য শঙ্কর-পার্বতীর, আরোগ্য লাভের জন্য অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের, জয়লাভের জন্য ইন্দ্রের এবং ধনলাভের জন্য কুবেরের পূজা করুন। এইরূপ বিবিধ কামনার উল্লেখ করে অবশেষে নির্ণয় করলেন যে, সমস্ত কামনা পূরণের জন্য এবং মোক্ষ লাভের জন্য একমাত্র নারায়ণের পূজা করা উচিত। **'তুলসী মূলহিঁ সীঁচিয়ে,**

ফুলই ফলই অঘাই।' অতএব সর্বব্যাপক প্রভুর স্মরণ করুন, যাঁকে লাভ করবার জন্য সদ্‌গুরুর শরণ, নিষ্কপটভাবে প্রশ্ন ও সেবা একমাত্র উপায়।

আসুরী ও দৈবী সম্পদ্ অন্তঃকরণের দুটি প্রবৃত্তিকে বলে। দৈবী সম্পদ্ পরমদেব পরমাত্মার দিগ্‌দর্শন করিয়ে দেয়, সেইজন্য একে দৈবী বলা হয়; কিন্তু এই প্রবৃত্তিও ত্রিগুণেরই অন্তর্ভুত। গুণাতীত হলে দৈবী সম্পদ্‌ও শান্ত হয়ে যায়। গুণাতীত, আত্মতৃপ্ত যোগীর জন্য কোন কর্তব্য বাকী থাকে না।

এখন প্রস্তুত বণ-র্ব্যবস্থা। বর্ণ জন্ম-প্রধান অথবা কর্মদ্বারা অন্তঃকরণে যা যোগ্যতা অর্জন হয় তার নাম? এই প্রসঙ্গে দেখুন—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।।৪১।।

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্মসমূহ স্বভাবজাত ত্রিগুণানুসারেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিভক্ত হয়েছে। স্বভাব সাত্ত্বিক হলে, আপনার মধ্যে নির্মলতা, ধ্যান-সমাধির ক্ষমতা থাকবে। তামসিক গুণ কাজ করলে আলস্য, নিদ্রা, প্রমাদ স্বভাবে দেখা যাবে। সেই স্তর অনুসারেই আপনার দ্বারা কর্মও হবে। যে গুণ কার্যরত, সেটাই আপনার বর্ণ, স্বরূপ। এইরূপ অর্দ্ধসাত্ত্বিক এবং অর্দ্ধরাজসিক গুণ ক্ষত্রিয় বর্গের মধ্যে দেখা যায় এবং অর্দ্ধেকের কম তামসিক ও বিশেষ রাজসিক গুণ দ্বিতীয় বর্গের বৈশ্য মধ্যে দেখা যায়।

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থবার উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই চারটি বর্গের মধ্যে থেকে এ বর্গ ক্ষত্রিয়ের নাম উল্লেখ করেছেন যে, ক্ষত্রিয়ের জন্য যুদ্ধ থেকে শ্রেয়স্কর আর কোন পথ নেই। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে, যারা দুর্বল গুণযুক্ত, তারা স্বভাব থেকে উৎপন্ন যোগ্যতা অনুসারে ধর্মে প্রবৃত্ত হবে, স্বধর্মে মৃত্যুও পরমকল্যাণকর. অন্যের অনুকরণ ভয়াবহ। চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন— চার বর্ণের রচনা আমি করেছি। তাহলে কি মানুষের চারটি জাতিতে বিভাগ করেছেন? বলছেন—না, '**গুণকর্ম বিভাগশঃ**'—গুণের যোগ্যতা অনুসারে কর্মকে চারটি স্তরে বিভাগ করেছেন। এখানে গুণ মানদণ্ড, এর দ্বারা কর্ম করার ক্ষমতাকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে একমাত্র অব্যক্ত পুরুষকে লাভ করবার

ক্রিয়া-বিশেষকে কর্ম বলে। ঈশ্বরপ্রাপ্তির আচরণ আরাধনা, যা শুরু হয় একমাত্র ইষ্টে শ্রদ্ধা থেকে। চিন্তনের বিধি-বিশেষ থেকে যা পূর্বে বলেছেন। এই যজ্ঞার্থ কর্মকে চার ভাগে বিভাগ করেছেন। এখন কিরূপে বোঝা যাবে যে আপনার মধ্যে কোন গুণ কার্যরত ও আপনি কোন শ্রেণীর? এই প্রসঙ্গে এখানে বলেছেন–

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্।।৪২।।

মনের শমন ও ইন্দ্রিয়সমূহের দমন, পূর্ণ পবিত্রতা; কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা, ক্ষমা, সরলতা, আস্তিক বুদ্ধি অর্থাৎ একমাত্র ইষ্টে আস্থা, জ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্ম-জ্ঞানের সঞ্চার, বিজ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মার কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশের জাগৃতি এবং সেই অনুসারে চলবার ক্ষমতা–এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। যখন স্বভাবে এই যোগ্যতাগুলি দেখা দেয়, নিরন্তর কর্ম হয় ও পরে কর্ম করা স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়, তখন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর যোগ্যতা অর্জন হয়েছে বলা যেতে পারে। এবং–

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীস্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।।৪৩।।

পরাক্রম, ঈশ্বরীয় তেজলাভ, ধৈর্য, চিন্তনে দক্ষতা অর্থাৎ '**কর্মসু কৌশলম্**'–কর্মকুশলতা, প্রকৃতির সংঘর্ষ থেকে পশ্চাৎপদ না হওয়ার স্বভাব, দান অর্থাৎ সর্বস্ব সমর্পণ, সকলভাবের উপর 'আমিই কর্তা'–এইভাব অর্থাৎ ঈশ্বরভাব–এইগুলি ক্ষত্রিয়ের '**স্বভাবজম্**'–স্বভাবজাত কর্ম। যাঁদের মধ্যে এই যোগ্যতাগুলি পাওয়া যায়, তাঁরা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর কর্তা। এখন প্রস্তুত বৈশ্য ও শূদ্রের স্বরূপ–

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।

পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।।৪৪।।

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম। গোপালনই কেন? তবে কি মহিস রক্ষা করবে না? ছাগল পুসবে না? এর তাৎপর্য হল ইন্দ্রিয়সমূহের রক্ষা। সুদূর বৈদিক বাঙ্ময়ে 'গো' শব্দ অন্ত:করণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের জন্য প্রচলিত ছিল। গোরক্ষার অর্থ ইন্দ্রিয়সমূহের রক্ষা। বিবেক-বৈরাগ্য-শম-দমদ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি সুরক্ষিত

হয়, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহদ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়, দুর্বল হয়। আত্মিক সম্পত্তিই স্থির সম্পত্তি। এটাই নিজধন, যা একবার অর্জন করতে সক্ষম হলে সর্বদা সঙ্গে থাকে। প্রকৃতির দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে এই সম্পত্তিগুলি সংগ্রহ করাই বাণিজ্য (**'বিদ্যা ধনং সর্বধন প্রধানম্'**—এই বিদ্যা অর্জন করাই বাণিজ্য।) কৃষি কাকে বলে? দেহটাই ক্ষেত্র। এর অন্তরালে যে বীজ বপন করা হয়, তা ভাল-মন্দ সংস্কাররূপে সঞ্চিত হয়। অর্জুন! এই নিষ্কাম কর্মে বীজ অর্থাৎ আরম্ভের নাশ হয় না। (তার মধ্যে থেকে কর্মের এই তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম অর্থাৎ ইষ্ট-চিন্তনই নিয়ত কর্ম) পরমতত্ত্ব চিন্তনের যে বীজ এই ক্ষেত্রে পড়ে আছে, তাকে সুরক্ষিত করে যাওয়া ও এতে যে বিজাতীয় বিকারগুলির আক্রমণ হয়, সেগুলির নিরাকরণ করে যাওয়াই কৃষি।

কৃষি নিরাবহিঁ চতুর কিসানা।
জিমি বুধ তজহিঁ মোহ মদ মানা।। (মানস, ৪/১৪/৮)

যাঁরা চতুর কৃষক, তাঁরা ভাল ফসললাভের জন্য আগাছাগুলি উন্মুলন করেন, ফলে ফসল ভাল তৈরী হয়, সেইরূপ বিবেকসম্পন্ন পুরুষগণই মোহ, মদ এবং মান পরিত্যাগ করেন।

এই প্রকার সকল ইন্দ্রিয়ের সুরক্ষা এবং প্রকৃতির দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে থেকে আত্মিক সম্পত্তি সংগ্রহ করা এবং এই ক্ষেত্রে পরমতত্ত্বের চিন্তনের বর্দ্ধন এইগুলি বৈশ্য শ্রেণীর কর্ম।

শ্রীকৃষ্ণে অনুসারে **'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ'**- যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলে আমরা যজ্ঞ থেকে পরাৎপর ব্রহ্মকে লাভ করি। সেই ব্রহ্মের আস্বাদন করে সন্তপুরুষগণ সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান। চিন্তন-ক্রিয়া দ্বারা তারই শনৈঃ শনৈঃ বীজারোপণ হয়। এর সুরক্ষা করে যাওয়াই কৃষিকার্য। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে অন্ন পরমাত্মা। সেই পরমাত্মাই একমাত্র অশন, অন্ন। চিন্তন-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে এই আত্মা পূর্ণ তৃপ্ত হয় আর কখনও অতৃপ্ত হয় না, আর আসা-যাওয়া করতে হয় না। এই অন্নের বীজকে অঙ্কুরিত করা এবং তার সুরক্ষা করে চলাকে কৃষিকার্য বলা হয়েছে।

নিজের থেকে উন্নত অবস্থাযুক্ত ব্যক্তিগণের, ঈশ্বরপ্রাপ্ত গুরুজনের সেবা করা শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম। শূদ্রের অর্থ হীন নয় বরং অল্পজ্ঞ। নিম্ন শ্রেণীর সাধকই শূদ্র। প্রবেশিকা শ্রেণীর সেই সাধক পরিচর্যা থেকেই সাধনা আরম্ভ করবে। ধীরে

ধীরে সেবাদ্বারা তার হৃদয়ে সেই সংস্কারগুলির সৃজন হবে এবং ক্রমশঃ সে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে পৌঁছে অবশেষে বর্ণগুলি পার করে ব্রহ্মে লীন হয় যাবে। স্বভাব পরিবর্তী হয় এবং স্বভাব পরিবর্তন হলে বর্ণ-পরিবর্তন হয়। বস্তুতঃ এই বর্ণের অবস্থা চারটি অতি উত্তম, উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট, কর্মপথের পথিকদের উঁচু-নীচু চারটি স্তর। কর্ম একটাই, নিয়ত কর্ম। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, পরমসিদ্ধিলাভ করার এটাই একমাত্র পথ, সেইজন্য স্বভাবে যেরূপ যোগ্যতা আছে, সেটাই সম্বল করে সেই স্থান থেকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করুন। এখন দেখুন—

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।

স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।।৪৫।।

মানুষ নিজ নিজ স্বভাবের যোগ্যতা অনুসারে কর্মে রত হয়ে '**সংসিদ্ধিম্**'-ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ পরমসিদ্ধিলাভ করে। পূর্বেও বলেছেন—এই কর্ম সম্পূর্ণ করে তুমি পরমসিদ্ধিলাভ করবে। কোন্ কর্ম করে? অর্জুন! তুমি শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্ম, যজ্ঞার্থ কর্ম কর। এখন স্বকর্ম করার ক্ষমতা অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত মানুষ কিরূপে পরমসিদ্ধিলাভ করেন, সেই বিধি তুমি আমার কাছে শ্রবণ কর। লক্ষ্য করুন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।

স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।৪৬।।

যে পরমেশ্বর থেকে ভূতগণের উৎপত্তি, যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, সেই পরমেশ্বরকে '**স্বকর্মণা**'—মানুষ স্বভাবজাত কর্মদ্বারা অর্চনা করে পরমসিদ্ধি লাভ করে। অতএব পরমাত্মার চিন্তন ও পরমাত্মারই সর্বাঙ্গীণ অর্চনা ও ক্রমশঃ চিন্তনপথে চলা আবশ্যক। যেমন কোন নিম্নশ্রেণীর ছাত্র যদি উচ্চ শ্রেণীতে পড়তে যায়, তাহলে সে তার নিজের শ্রেণীর যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলবে, উচ্চ শ্রেণীর যোগ্যতা তো লাভ হবেই না। অতএব এই কর্মপথে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যেতে হবে। যেমন ১৮/৬ দ্রষ্টব্য। এর উপরই জোর দিয়ে পুনরায় বলছেন যে, যদি আপনি অল্পজ্ঞ, তবু সেই স্তর থেকেই শুরু করুন। সেই বিধি হল—পরমাত্মার প্রতি সমর্পণ।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।৪৭।।

স্বীয় ধর্ম অঙ্গহীনভাবে অনুষ্ঠিত হলেও সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। **'স্বভাব নিয়তং'**-স্বভাবদ্বারা নির্ধারিত কর্ম করে মানুষকে পাপ অর্থাৎ আসা-যাওয়া করতে হয় না। প্রায়ই সাধকগণ উদ্বিগ্ন হন, চিন্তা করেন—আমি কি সেবা করতেই থাকব, তিনি তো ধ্যানস্থ, গুণের জন্য তাঁকে সম্মান করা হয়, এই চিন্তা করে তাঁরাও অনুকরণ করতে শুরু করেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে অনুকরণ অথবা ঈর্ষা করলে কিছু লাভ হবে না। স্বভাবের ক্ষমতা অনুসারে কর্ম করেই সাধক পরমসিদ্ধি লাভ করেন, ত্যাগ করে নয়।

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।

সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধুমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।।৪৮।।

কৌন্তেয় ! দোষযুক্ত (অল্পজ্ঞ অবস্থাযুক্ত হলে দোষের বাহুল্য হওয়া স্বাভাবিক, এইরূপ দোষযুক্তও) **'সহজং কর্ম'**—স্বভাবজাত সহজ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয় কারণ ধুমদ্বারা আচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সকল কর্মই দোষযুক্ত। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর হলেও, কর্ম তো করতেই হচ্ছে। যতক্ষণ স্থিতিলাভ হয়, ততক্ষণ দোষ বিদ্যমান, প্রকৃতির আবরণ বিদ্যমান। যেখানে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কর্মও ব্রহ্মে প্রবেশের সঙ্গে বিলয় হয়, তখনই দোষমুক্ত হওয়া যায়। প্রাপ্তিযুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি, যখন কর্ম করার প্রয়োজন থাকে না ?-

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি।।৪৯।।

সকল বিষয়ে অনাসক্ত, স্পৃহাশূণ্য, সংযতচিত্ত পুরুষ **'সন্ন্যাসিনাম্'**—সর্বস্ব ন্যাসের দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্যে সিদ্ধিলাভ করেন। এখানে সন্ন্যাস ও পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি একই পর্যায়ভুক্ত। সাংখ্য যোগীও সেই অবস্থালাভ করেন, যে অবস্থা নিষ্কাম কর্মযোগী লাভ করেন। উভয় মার্গীই সমান উপলব্ধি করেন। এখন পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ যে ভাবে ব্রহ্মলাভ করেন, সংক্ষেপে তার বর্ণনা করেছেন—

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।

সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা।।৫০।।

কৌন্তেয়! এইরূপ সিদ্ধিপাপ্ত পুরুষ জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের পরমনিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তিরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। জ্ঞাননিষ্ঠার উক্ত প্রাপ্তিক্রম সংক্ষেপে আমার কাছে শ্রবণ কর। পরের শ্লোকে সেই বিধি সম্বন্ধে বলছেন, লক্ষ্য করুন–

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।।৫১।।

বিবিক্তসেবী লঘ্বাসী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।।৫২।।

অর্জুন! বিশেষরূপে শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হয়ে নির্জন ও পবিত্র স্থানে অবস্থান, পরিমিত আহার করেন, বাক্য, শরীর ও মন সংযত করে, দৃঢ় বৈরাগ্য অবলম্বন করে, নিরন্তর ধ্যাননিষ্ঠ ও যোগপরায়ণ হয়ে, অন্তঃকরণবশীভূত করে, শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগপূর্বক, আসক্তি ও দ্বেষ বর্জন করে এবং–

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।৫৩।।

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, বাহ্য বস্তু ও আন্তরিক চিন্তন পরিত্যাগ করে, মমতাবর্জিত এবং চিত্তবিক্ষেপশূণ্য পুরুষ পরব্রহ্ম লাভে সমর্থ হন। আরও দেখুন–

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।৫৪।।

এইরূপ ব্রহ্মে একীভূত হয়ে সেই প্রসন্নচিত্ত পুরুষ কোন বিষয়ে শোক করেন না এবং কিছুই আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সর্বভূতে সমভাব সেই পুরুষ ভক্তির পরাকাষ্ঠায় স্থিত হন। ভক্তি এখানে পরিণামস্বরূপ ব্রহ্মেস্থিতি প্রদান করে। এখন–

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।৫৫।।

সেই পরাভক্তিদ্বারা তিনি আমাকে তত্ত্বতঃ জানেন। সেই তত্ত্ব কি? আমি 'যে'ও যেরূপ প্রভাবযুক্ত, অজর-অমর-শাশ্বত যে অলৌকিক গুণধর্মযুক্ত, আমার

এই তত্ত্ব অবগত হয়ে তিনি আমাতে প্রবেশ করেন। প্রাপ্তিকালে ভগবানের দর্শন করেন ও প্রাপ্তির ঠিক পরেই তিনি আত্মস্বরূপকে সেই ঈশ্বরীয় গুণধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত দেখেন যে, আত্মাই অজর, অমর, শাশ্বত, অব্যক্ত ও সনাতন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—আত্মাই সত্য, সনাতন, অব্যক্ত ও অমৃতস্বরূপ; কিন্তু এই সমস্ত বিভূতিযুক্ত আত্মাকে কেবল তত্ত্ব দর্শীগণই দেখেছেন। এখন প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, বস্তুতঃ সেই তত্ত্বদর্শিতা কি? বহু লোক পাঁচ তত্ত্ব, পঁচিশ তত্ত্বের বৌদ্ধিক গণনা শুরু করেন; কিন্তু এই বিষয়ের উপর শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তুত অধ্যায়ে নির্ণয় করে বললেন যে, সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মা. যিনি তাঁকে জানেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী। এখন যদি আপনি সেই তত্ত্বলাভের ইচ্ছুক, পরমাত্ম-তত্ত্ব লাভের ইচ্ছুক তাহলে ভজন-চিন্তন আবশ্যক।

এখানে শ্লোক উনপঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশপর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করলেন যে সন্ন্যাস মার্গেও কর্ম করতে হয়। তিনি বললেন, **‘সন্ন্যাসেন’**- সন্ন্যাসদ্বারা (অর্থাৎ জ্ঞানযোগের দ্বারা) কর্ম করতে করতে ইচ্ছাশূণ্য, আসক্তিশূণ্য এবং সংযত চিত্ত পুরুষ যেভাবে নৈষ্কর্ম্যের পরমসিদ্ধিলাভ করেন, তা সংক্ষেপে বলব। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম-ক্রোধ, মদ-মোহ ইত্যাদি যে বিকারগুলি প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করে, সেগুলি যখন শান্ত হয় এবং বিবেক, বৈরাগ্য, শম-দম, নির্জনে বাস, ধ্যান ইত্যাদি ব্রহ্মে প্রবেশ করতে সাহায্য করে যে যোগ্যতাগুলি, সে সমস্ত যখন পরিপক্ক হয়, তখন ব্রহ্মকে জানার যোগ্যতা লাভ হয়। সেই যোগ্যতার নাম পরাভক্তি, এই যোগ্যতার দ্বারাই তত্ত্বকে জানা যায়। তত্ত্ব কি? আমাকে জানা। ভগবান যে যে বিভূতিযুক্ত, যিনি ভগবানকে তাঁর বিভূতিসহ জানেন, তিনি আমাতে স্থিত হন। ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বর, পরমাত্মা ও আত্মা একে অন্যের পর্যায়। একটিকে জানতে পারলে বাকি সব জানা যায়। এই হল পরমসিদ্ধি, পরমগতি ও পরমধাম।

অতএব গীতাশাস্ত্রে দৃঢ় নির্ণয় এই যে, সন্ন্যাস ও নিষ্কাম কর্মযোগ দুটি পরিস্থিতিতেই পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিলাভ করার জন্য নিয়ত কর্ম (চিন্তন) অনিবার্য।

এ পর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর জন্য ভজন-চিন্তন করবার উপর জোর দিয়েছেন, এখন সমর্পণ বলে সেই বার্তাকে নিষ্কাম কর্মযোগীর জন্যও বলছেন—

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শ্বাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌।।৫৬।।

আমার উপর সম্পূর্ণরূপে আশ্রিত পুরুষ সর্বদা সমস্ত কর্ম করেও, লেশমাত্রও ত্রুটি না রেখে কর্ম করে আমার অনুগ্রহে শাশ্বত, অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত হন। কর্ম সেই এক নিয়ত কর্ম, যজ্ঞের প্রক্রিয়া। পূর্ণরূপে যোগেশ্বর সদ্‌গুরুর আশ্রিত সাধক তাঁর অনুগ্রহে শাশ্বত পরমপদ শীঘ্র লাভ করেন। অতএব তাঁকে লাভ করার জন্য সমর্পণ আবশ্যক।

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।।৫৭।।

অতএব অর্জুন! সমস্ত কর্ম (যতটা তোমার দ্বারা সম্ভব) আমাতে সমর্পণপূর্বক, নিজের ভরসায় নয় বরং আমাতে সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হবে অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ অবলম্বনপূর্বক সর্বদা আমাতে চিত্ত সমাহিত কর। যোগ একটাই, যা সর্বপ্রকারের দুঃখের বিনাশ করে এবং পরমতত্ত্ব পরমাত্মাতে প্রবেশ প্রদান করে। এর ক্রিয়া একটাই–যজ্ঞের প্রক্রিয়া, যা মন ও সকল ইন্দ্রিয়ের সংযম, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এবং ধ্যান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। যার পরিণামও এক-'**যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্‌**।' এই প্রসঙ্গেই আরও বলেছেন–

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।।৫৮।।

আমাতে চিত্ত অর্পণ করলে আমার অনুগ্রহে তুমি মন ও সকল ইন্দ্রিয়ের দুর্গগুলিকে অতিক্রম করবে। "**ইন্দ্রিহ্ন দ্বার ঝরোখা নানা। তহঁ তহঁ সুর বৈঠে করি থানা।। আবত দেখহি বিষয় বয়ারী। তে হঠি দেহিঁ কপাট উঘারী।।**" এইগুলিই দুর্জয় দুর্গ। আমার অনুগ্রহে তুমি এই বাধা সকল অতিক্রম করবে কিন্তু যদি তুমি অভিমানবশতঃ আমার কথা না শোন, তাহলে তোমার বিনাশ হবে, পরমার্থের অযোগ্য হবে। পুনরায় এই প্রসঙ্গের উপর জোর দিলেন–

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।।৫৯।।

অহঙ্কারকে আশ্রয় করে 'যুদ্ধ করব না' এইরূপ যা চিন্তন করছ, তোমার এই নিশ্চয় ভ্রমমূলক। কারণ, তোমার ক্ষাত্র স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করবে।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।

কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎকরিষ্যস্যবশোহপি তৎ।।৬০।।

কৌন্তেয়! অজ্ঞানবশতঃ তুমি যে কর্ম করতে চাইছ না, স্বভাবজাত স্বীয় ক্ষত্রিয়োচিত কর্মে আবদ্ধ হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা করবে। প্রকৃতির সংঘর্ষ থেকে পশ্চাৎপদ না হওয়ার তোমার ক্ষত্রিয়শ্রেণীর স্বভাব তোমাকে বলপূর্বক কর্মে নিযুক্ত করবে। প্রশ্নটি সম্পূর্ণ হল। এখন প্রশ্ন, সেই ঈশ্বর কোথায় বাস করেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া।।৬১।।

অর্জুন! ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। এত কাছে থাকা সত্ত্বেও লোকে জানতে পারে না, কেন? মায়ারূপ যন্ত্রে আরূঢ় সকলেই ভ্রান্ত হয়ে ভ্রমণ করছে, সেইজন্য জানতে পারে না। এই যন্ত্র বাধাস্বরূপ, যা বার বার নশ্বর কলেবরে ভ্রমণ করাতে থাকে। তাহলে কার শরণে যাওয়া উচিত?—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।

তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।৬২।।

সেইজন্য হে ভারত! সর্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের (যিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত) শরণাগত হও। তাঁর অনুগ্রহে তুমি পরমশান্তি, শাশ্বত পরমধাম প্রাপ্ত হবে। অতএব যদি ধ্যান করতে চান, তাহলে হৃদয়-দেশ-এ করুন। এই সম্বন্ধে জানার পর মন্দির, মসজিদ, চার্চ অথবা অন্যত্র সন্ধান করা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে জানা না থাকলে, এটা স্বাভাবিক। ঈশ্বরের নিবাস-স্থান হৃদয়। ভাগবতের চতুঃশ্লোকী গীতার সারাংশও এই যে, যদিও আমি সর্বত্র ব্যাপ্ত; কিন্তু হৃদয়-দেশ ধ্যান করলেই আমাকে লাভ করা যেতে পারে।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।

বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।।৬৩।।

এই প্রকার আমি তোমার কাছে গুহ্য থেকেও গুহ্যতর জ্ঞান বললাম। তুমি এটি সম্পূর্ণরূপে বিচার করে; যা ইচ্ছে হয় তা-ই অনুষ্ঠান কর। সত্য অনুসন্ধানের স্থান ও প্রাপ্তি স্থানও এটাই। কিন্তু হৃদয়স্থিত ঈশ্বরকে দেখা যায় না, এর উপায় বলছেন–

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢমিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।।৬৪।।

অর্জুন! সর্বাপেক্ষা গুহ্য আমার রহস্যযুক্ত বাক্য তুমি পুনরায় শ্রবণ কর (পূর্বে বলেছেন, কিন্তু পুনরায় শ্রবণ কর। সাধকের জন্য ইষ্ট সদা প্রস্তুত থাকেন) কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এইজন্য তোমার হিতকর বাক্য আমি পুনরায় বলছি। তা কি?–

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।।৬৫।।

অর্জুন! তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর, আমার অনন্য ভক্ত হও, আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও (সমর্পণে অশ্রুপাত যেন হয়) এবং আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে, কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। পূর্বে বলেছেন–ঈশ্বর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তাঁর শরণাগত হও। এখানে বলছেন–আমার শরণে এস। এই গুহ্যতর রহস্যযুক্ত বাক্য শোন, আমার শরণে এস। বাস্তবে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কি বলতে চাইছেন? এই যে সাধকের জন্য সদ্গুরুর শরণ নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণযোগেশ্বর ছিলেন। এখন সমর্পনের বিধি সম্বন্ধে বলেছেন–

সর্বধর্মান্পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।৬৬।।

সকল ধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক (অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কর্তা অথবা শূদ্র শ্রেণীর, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য শ্রেণীর–এই বিচার পরিত্যাগ করে) কেবল একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমি সকল পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করব। শোক করো না।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণগুলির বিচার না করে (এই যে, আমি এই কর্মপথে কোন শ্রেণীর) যিনি একমাত্র পরমেশ্বরের শরণাগত হন, ইষ্টের অতিরিক্ত অন্য কারও কাছ থেকে কৃপা পেতে চান না, তাঁর ক্রমশঃ বর্ণ-পরিবর্তন, উত্থান ও সমস্ত পাপ থেকে নিবৃত্তির (মোক্ষ) দায়িত্ব ইষ্ট সদ্‌গুরু স্বয়ং নিজের হাতে তুলে নেন।

প্রত্যেক মহাপুরুষ এই কথাই বলেছেন। শাস্ত্র যখন লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন মনে হয় যে সেটা সকলের জন্য; কিন্তু সেটা শুধু শ্রদ্ধাবান্‌দের জন্যই। অর্জুন অধিকারী ছিলেন, তা-ই তাঁকে জোর দিয়ে বললেন। এখন যোগেশ্বর স্বয়ং নির্ণয় করে বলছেন যে, এর অধিকারী কে?—

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।

ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি।।৬৭।।

অর্জুন! এইরূপ হিতের জন্য তোমাকে উপদিষ্ট এই গীতাশাস্ত্র তপস্যাহীন ব্যক্তি বলবে না, ভক্তিরহিত ব্যক্তিকে কখনও বলবে না, যে শ্রবণেচ্ছু নয় তাকে বলবে না ও আমাকে নিন্দা করে যারা—এই দোষ আমাতে, ঐ দোষ আমাতে এই প্রকার মিথ্যা সমালোচনা করে যারা, তাদেরও বলবে না। মহাপুরুষ তো ছিলেন, যার সমক্ষে স্তুতিকর্তাদের সাথে সাথে কতিপয় নিন্দুকও হয়ত ছিল। নিন্দুকদের বলবে না। কিন্তু প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, কাকে বলা উচিত? এই প্রসঙ্গে দেখুন—

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।।৬৮।।

যিনি আমার পরাভক্তিলাভ করে এই পরমগুহ্য গীতাশাস্ত্রের উপদেশ আমার ভক্তের কাছে পাঠ ও ব্যাখ্যা করবেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমাকে লাভ করবেন। কারণ যিনি উপদেশ উত্তমরূপে শ্রবণ করে হৃদয়ঙ্গম করে নেবেন, তিনি সেই পথে চলবেন ও উদ্ধার হয়ে যাবেন। এখন সেই উপদেশকর্তার সম্বন্ধে বলছেন—

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।।৬৯।।

মনুষ্যগণের মধ্যে উপদেশকর্তার অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় এ জগতে আর কেউ নেই এবং আর কেউ হবেও না। কার থেকে? যিনি আমার ভক্তগণের

মধ্যে আমার উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করবেন, সেই পথে তাদের চালাবেন; কারণ কল্যাণের স্রোত এই একটাই, রাজমার্গ। এখন দেখুন অধ্যয়ন—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।।৭০।।

যে ব্যক্তি আমাদের উভয়ের ধর্মময় সংবাদরূপ গ্রন্থ 'অধ্যেষ্যতে'—মনন করবেন, তাঁর সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব অর্থাৎ এইরূপ যজ্ঞ যার পরিণাম হল জ্ঞান, যার স্বরূপ পূর্বে বলা হয়েছে, যার তাৎপর্য—সাক্ষাৎ করে তাঁকে অবগত হওয়া, এই আমার অভিমত।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোহপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্প্রাপ্নুয়াৎপুণ্যকর্মণাম্।।৭১।।

যিনি শ্রদ্ধালু ও অসূয়াশূণ্য হয়ে অর্থবোধ না হলেও এই গীতা শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হয়ে উত্তমকর্মকারিগণের প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ লোকলাভ করেন। অর্থাৎ কর্মে সক্ষম না হলে কেবল শ্রবণ করুন, তবুও উত্তম লোকলাভ হবে; কারণ এতে উপদেশ গ্রহণ হয়। এখানে সাতসট্টি থেকে একাত্তরপর্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপদেশ অনাধিকারীদের বলতে বারণ করেছেন; কিন্তু যিনি শ্রদ্ধাবান, তাঁকে অবশ্য বলা উচিত। যিনি শ্রবণ করবেন, তিনি আমাকে লাভ করবেন; কারণ অতি গোপনীয় কথা শুনে মানুষ সেই অনুসারে আচরণ করতে শুরু করে। যিনি ভক্তগণের মাঝে বলবেন, তাঁর সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব। যজ্ঞের পরিণাম জ্ঞান। যিনি গীতাশাস্ত্রের অনুসারে কর্ম করতে অসমর্থ; কিন্তু শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করেন, তিনি পুণ্যলোকলাভ করেন। এইপ্রকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর পাঠ-শ্রবণ এবং অধ্যয়নে কি ফললাভ হয়, তা বললেন। প্রশ্নটি সম্পূর্ণ হল। অবশেষে তিনি অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কিছু বুঝতে পারলে কি?

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়।।৭২।।

হে পার্থ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতাশাস্ত্র শুনেছ? তোমার অজ্ঞানজনিত মোহের বিনাশ হল কি? এই প্রসঙ্গে অর্জুন বলছেন—

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।

স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।৭৩।।

অচ্যুত! আপনার কৃপাতে আমার মোহ নষ্ট হয়েছে এবং স্মৃতিলাভ হয়েছে। (মনু যে রহস্যময় জ্ঞানের সূত্রপাত স্মৃতি-পরম্পরায় করেছিলেন, অর্জুন সেই জ্ঞানলাভ করেছিলেন।) আমি নিঃসংশয় হয়ে অবস্থিত, এখন আপনার আজ্ঞাপালন করব। যদিও সৈন্য নিরীক্ষণের সময় উভয় সেনাতেই স্বজনদের দেখে অর্জুন ব্যাকুল হয়েছিলেন। তিনি নিবেদন করেছিলেন যে, গোবিন্দ! স্বজনদের বধ করে কিরূপে আমরা সুখী হব? এইরূপ যুদ্ধে শাশ্বত কুলধর্ম নষ্ট হবে, পিণ্ডোদক ক্রিয়া লুপ্ত পাবে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে। আমরা বুদ্ধিমান্ হয়েও পাপ করতে উদ্যত হয়েছি। এগুলি এড়িয়ে চলার উপায় আমরা খুঁজব না কেন? শস্ত্রধারী কৌরবগণ শস্ত্ররহিত আমাকে রণে মেরেই ফেলুক না কেন, সেই মৃত্যুও শ্রেয়স্কর। গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করব না, বলে তিনি রথের পশ্চাৎভাগে বসে পড়লেন।

এইপ্রকার গীতাশাস্ত্রে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন প্রশ্নের পরিপ্রশ্ন করেছিলেন। যেমন অধ্যায় ২/৭—সেই সাধন আমাকে বলুন, যা আমার পক্ষে পরমশ্রেয়স্কর। ২/৫৪—স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের লক্ষণ কি? ৩/১—যদি আপনার মতে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে এই ভয়ঙ্কর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন? ৩/৩৬—মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়? ৪/৪—আপনার জন্ম অনেক পরে হয়েছে এবং সূর্যের জন্ম বহু পূর্বে হয়েছিল। আপনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্যকে এই যোগ বলেছিলেন, তা কিরূপে বুঝব? ৫/১—কখনও আপনি সর্বকর্মের ত্যাগ আবার কখনও নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করতে বলছেন। এই দুটির মধ্যে যেটি প্রকৃতপক্ষে পরমশ্রেয় প্রদান করে, তা আমাকে নিশ্চয় করে বলুন। ৬/৩৫—মন যে চঞ্চল, তাহলে শিথিল যত্নশীল শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ আপনাকে প্রাপ্ত না হলে কোন মার্গে গমন করেন? ৮/১-২—গোবিন্দ! যাঁর আপনি বর্ণনা করলেন, সেইব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? অধিদৈব, অধিভূত কাকে বলে? এই দেহে অধিযজ্ঞ কে? সেই কর্ম কি? মৃত্যুকালে ব্যক্তিগণ কিরূপে আপনাকে জানতে পারেন? সাতটি প্রশ্ন করলেন। অধ্যায় ১০/১৭—তে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন যে, কিরূপে সতত আপনার চিন্তন

করলে আমি আপনাকে জানতে পারব? এবং কোন কোন বস্তুতে আপনাকে আমি ধ্যান করব? ১১/৪–অর্জুন নিবেদন করলেন যে, যদি আমি যোগ্য হই, তাহলে যে যে বিভূতির আপনি বর্ণনা করলেন, সেগুলি আমি প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছা করি। ১২/১–অনন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে নিযুক্ত যে সকল ভক্তজন উত্তমরূপে আপনার উপাসনা করেন এবং যাঁরা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন, উভয়ের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা? ১৪/২১–গুণাতীতের লক্ষণ কি এবং কি উপায়ে গুণাতীত হওয়া যায়? ১৭/১–যাঁরা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করেন, তাঁদের গতি কি হয়? এবং ১৮/১–হে মহাবাহো! আমি ত্যাগ ও সন্ন্যাসের যথার্থস্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জানতে ইচ্ছা করি।

এইভাবে অর্জুন প্রশ্ন-পরিপ্রশ্ন করে গেলেন। যে প্রশ্ন তিনি করতে পারেননি, সে সকল গোপনীয় রহস্যের সমাধান ভগবান স্বয়ং করেছেন। এগুলির সমাধনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রশ্ন থেকে বিরত হয়ে বললেন, গোবিন্দ! এখন আমি আপনার আজ্ঞাপালন করব। বস্তুতঃ এই সমস্ত প্রশ্নই মানুষ মাত্রের জন্য। এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান না হলে কোন সাধকই শ্রেয়-পথ-এ এগিয়ে যেতে পারেন না। অতএব সদ্গুরুর আদেশপালন করার জন্য, শ্রেয়-পথ-এ এগিয়ে যাবার জন্য, গীতাশাস্ত্রের সম্পূর্ণটাই শুনে যাওয়া অত্যাবশ্যক। অর্জুনের সমাধান হয়ে গেল। তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীর উপসংহার হল। এই প্রসঙ্গে সঞ্জয় বললেন–

[একাদশ অধ্যায়ে বিরাট রূপের দর্শন দিয়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, অর্জুন! কেবল অনন্য ভক্তিদ্বারাই এইরূপ আমাকে প্রত্যক্ষ করতে (যেরূপ তুমি দর্শন করেছ), তত্ত্বতঃ জানতে ও প্রবেশ করতে সুলভ (১১/৫৪)। এইরূপ দর্শন করে সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন ও এখানে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন–তোমার মোহ নষ্ট হয়েছে কি? অর্জুন বললেন যে, তাঁর মোহনাশ হয়েছে। স্মৃতিলাভ হয়েছে। এখন আপনার উপদেশপালন করব। দর্শন করে অর্জুনের মুক্ত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। বস্তুতঃ তাঁর যে স্থিতিলাভ করার ছিল, তা তিনি লাভ করেছিলেন; কিন্তু শাস্ত্র উত্তরপুরুষদের জন্য হয়। তার উপযোগিতা আপনাদের সকলের জন্যই।]

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।।৭৪।।

আমি এইরূপ বাসুদেব ও মহাত্মা অর্জুনের (অর্জুন মহাত্মা, যোগী, সাধক, কোন ধনুর্ধর নন, যিনি বধ করবার জন্য প্রস্তুত। অতএব মহাত্মা অর্জুনের) এই বিলক্ষণ ও রোমাঞ্চকর কথোপকথন শ্রবণ করলাম। কিরূপে তিনি শ্রবণে সমর্থ হয়েছিলেন? আরও বলছেন—

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎকৃষ্ণাৎসাক্ষাৎকথয়তঃ স্বয়ম্।।৭৫।।

শ্রীব্যাসদেবের কৃপাপ্রসাদে লব্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা আমি এই পরমগুহ্য যোগ স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে সাক্ষাৎ শ্রবণ করেছি। সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলে মনে করেন। যিনি স্বয়ং যোগী ও অন্যকেও যোগ প্রদান করতে সমর্থ, তিনিই যোগেশ্বর।

রাজন্সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।।৭৬।।

হে রাজন্! কেশব ও অর্জুনের এই পরমকল্যাণকরও অদ্ভুত কথোপকথন পুনঃ স্মরণ করে আমি মুহুর্মুহু আনন্দিত হচ্ছি। অতএব এই কথোপকথন সর্বদা স্মরণ করা উচিত ও স্মরণ করে প্রসন্ন থাকা উচিত। এখন তাঁর স্বরূপ স্মরণ করে সঞ্জয় বললেন—

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।।৭৭।।

হে রাজন! হরির (যিনি শুভাশুভ হরণ করে তিনিই শুধু বিরাজিত, সেই হরির) সেই অত্যদ্ভুত রূপ বার বার স্মরণ করে আমার মহাবিস্ময় হচ্ছে এবং আমি পুনঃপুনঃ হৃষ্ট হচ্ছি। ইষ্টের স্বরূপ বার বার স্মরণ করা উচিত। অবশেষে সঞ্জয় নির্ণয় করে বললেন—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।।৭৮।।

রাজন্! যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও ধনুর্ধারী অর্জুন (ধ্যানই ধনুক, ইন্দ্রিয়সমূহের দৃঢ়তাই গাণ্ডীব অর্থাৎ স্থিরভাবে যিনি ধ্যান করেন, তিনিই মহাত্মা অর্জুন) সেই পক্ষে **'শ্রীঃ'**-ঐশ্বর্য, বিজয়- যার পশ্চাতে পরাজয় নেই, ঈশ্বরীয় বিভূতি ও চলে সংসারে অচলনীতি বিরাজ করে, এই আমার অভিমত।

বর্তমানে অর্জুন নেই। তবে কি এই নীতি, বিজয়-বিভূতি অর্জুন পর্যন্তই সীমিত ছিল। তৎসাময়িক ছিল। তাহলে কি দ্বাপরযুগেই শেষ হয়ে গেছে? না। যোগেশ্বর বলেছেন যে, আমি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। আপনার হৃদয়েও তিনি আছেন। অনুরাগই অর্জুন। আপনার অন্তঃকরণের ইষ্টোন্মুখ নিষ্ঠার নাম অনুরাগ। যদি আপনার হৃদয় অনুরাগের পূর্ণ, তাহলে সর্বদা বাস্তবিক বিজয় ও অচল স্থিতি প্রদানকারী নীতি সর্বদাই থাকবে, এমন নয় যে কখনও তা ছিল, এখন নেই। যতক্ষণ প্রাণী থাকবে, ততক্ষণ পরমাত্মা তাদের হৃদয়ে নিবাস করবেন। ব্যাকুল আত্মা তাঁকে লাভ করতে চাইবে, তাদের মধ্যে যারই হৃদয় তাঁকে লাভ করার জন্য অনুরাগে ভরে উঠবে, তিনিই অর্জুনের শ্রেণীভুক্ত হবেন; কারণ অনুরাগই অর্জুন। অতএব মানুষ মাত্রই প্রত্যাশী হতে পারেন।

নিষ্কর্ষ –

গীতাশাস্ত্রের এটাই অন্তিম অধ্যায়। শুরুতেই অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, প্রভু ! আমি ত্যাগ ও সন্ন্যাসের ভেদ এবং স্বরূপ জানতে চাই। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এরজন্য চারটি প্রচলিত মতের উল্লেখ করলেন। এর মধ্যেই সঠিক মতটিও ছিল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কোন কালে ত্যাগ করা উচিত নয়। এগুলি মনীষীগণকেও পবিত্র করে। এই তিনটিতে প্রবৃত্ত থেকে, এদের বিরোধী বিকারগুলিকে ত্যাগ করাই যথার্থ ত্যাগ। একেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। ফলকামনা করে যে ত্যাগ করা হয়, তা রাজসিক ত্যাগ এবং মোহগ্রস্ত হয়ে নিয়ত কর্মেরই ত্যাগকে তামসিক ত্যাগ বলে। এবং সন্ন্যাস ত্যাগেরই চরমোৎকৃষ্ট অবস্থাকে বলে। নিয়ত কর্ম ও ধ্যানজনিত সুখ, সাত্ত্বিক সুখ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহের ভোগ রাজসিক ও তৃপ্তিদায়ক অন্নের উৎপত্তি থেকে রহিত দুঃখপূর্ণ সুখ তামসিক।

মানুষ মাত্র দ্বারা শাস্ত্রের অনুকূল অথবা প্রতিকূল যে কাজ সম্পাদন হয়, তা সম্পাদনের কারণ পাঁচটি–কর্তা (মন), পৃথক্ পৃথক্ করণ (যাদের দ্বারা কর্ম সম্পন্ন হয়। বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, করণরূপে থাকলে শুভ কর্মসম্পাদন হয়। কাম, ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি করণ হলে শুভ কাজ হয় না), নানা ইচ্ছা (ইচ্ছা অনন্ত, সব ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। কেবল সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, যার সঙ্গে আধার পাওয়া যায়।) চতুর্থ কারণ আধার (সাধন) ও পঞ্চম হেতু-দৈব (প্রারব্ধ অথবা সংস্কার)। এই পাঁচটি কারণেই প্রত্যেকটি কাজ হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও যাঁরা কৈবল্যস্বরূপ পরমাত্মাকে কর্তা বলে মনে করেন, সেই মূঢ়ব্যক্তি যথার্থ জানে না। অর্থাৎ ভগবান করেন না; কিন্তু পূর্বে বলেছেন যে, অর্জুন! তুমি নিমিত্ত মাত্র হও, কর্তা-হর্তা তো আমি। অন্ততঃ সেই মহাপুরুষ কি বলতে চাইছেন?

বস্তুতঃ প্রকৃতি ও পুরুষের মাঝে এক আকর্ষণ সীমা আছে। যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতিতে লিপ্ত, ততক্ষণ মায়া কাজ করার প্রেরণা প্রদান করে, যখন সাধক এর ঊর্ধ্বে উঠে ইষ্টের কাছে আত্মা সমর্পণ করেন ও ইষ্ট হৃদয়-দেশ-এ রথী হন, তখন ভগবান করেন। অর্জুন সেই স্তরের ছিলেন, সঞ্জয়ও ছিলেন, সকলেই এই স্তরে পৌঁছাতে পারেন। অতএব এই স্তর থেকেই ভগবান প্রেরণা প্রদান করেন। পূর্ণজ্ঞাতা মহাপুরুষ, জানবার বিধি ও জ্ঞেয় পরমাত্মা-এই তিনটির সংযোগেই কর্মের প্রেরণালাভ হয়। সেইজন্য কোন মহাপুরুষের (সদ্গুরুর) সান্নিধ্যে গিয়ে এই গুঢ়বিষয় সম্বন্ধে জানবার জন্য প্রযত্নশীল হওয়া উচিত।

বর্ণ-ব্যবস্থার সম্বন্ধে চতুর্থবার উল্লেখ করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ইন্দ্রিয়ের দমন, মনের শমন, একাগ্রতা, কায়মনোবাক্যে তপস্যা, ঈশ্বরীয় জ্ঞানের সঞ্চার, ঈশ্বরীয় নির্দেশ অনুযায়ী চলবার ক্ষমতা ইত্যাদি ব্রহ্মে প্রবেশ প্রদান করে যে যোগ্যতাগুলি, সেগুলি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কর্ম। শৌর্য, পশ্চাৎপদ না হওয়ার স্বভাব, সকলভাবের উপর প্রভুত্ব, কর্মে প্রবৃত্ত হবার দক্ষতা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর কর্ম। ইন্দ্রিয়সমূহের সংরক্ষণ, আত্মিক সম্পত্তির বৃদ্ধি ইত্যাদি বৈশ্য শ্রেণীর কর্ম এবং পরিচর্যা শূদ্র শ্রেণীর কর্ম। শূদ্রের অর্থ অল্পজ্ঞ। অল্পজ্ঞ সাধক নিয়ত কর্ম চিন্তনে দুঘন্টা বসে দশ মিনিটও একাগ্রচিত্ত হতে পারে না। দেহটাকে বসিয়ে রাখে কিন্তু যে মনকে স্থির হওয়া উচিত, সে তো কুতর্কের জাল বুনতে থাকে। এরূপ সাধকের কল্যাণ কিরূপে হবে?

তার নিজের থেকে উন্নত ব্যক্তির সেবা করা উচিত অথবা সদ্‌গুরুর সেবা করা উচিত। ধীরে ধীরে তার মধ্যে সংস্কারের সৃজন হবে, সাধনপথে দ্রুত এগিয়ে যাবে। অতএব এই অল্পজ্ঞের কর্ম, সেবা থেকেই শুরু হবে। কর্ম একটাই-নিয়ত কর্ম, চিন্তন। যাঁরা এই কর্ম করেন, তাঁরা চারটি স্তরের অন্তর্ভুক্ত। অতি উত্তম, উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট এরাই হলেন ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। মানুষকে নয় বরং গুণের মাধ্যমে কর্মকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই হল গীতোক্ত বর্ণ।

তত্ত্ব স্পষ্ট করে তিনি বললেন, অর্জুন! সেই পরমসিদ্ধির বিধি বলব, যা জ্ঞানের পরানিষ্ঠা। বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, ধারাবাহিক চিন্তন ও ধ্যান প্রবৃত্তি, ব্রহ্মে প্রবেশ প্রদানকারী সমস্ত যোগ্যতা যখন পরিপক্ক হয়; কাম, ক্রোধ, মোহ, রাগ-দ্বেষাদি প্রকৃতিতে ভ্রমণ করাতে থাকে যে প্রবৃত্তিগুলি, সেগুলি যখন সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়, তখন ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানার যোগ্য হয়। সেই যোগ্যতাকে পরাভক্তি বলে। পরাভক্তির দ্বারা তত্ত্বকে জানা যায়। তত্ত্ব কি? বললেন—আমি যে এবং যে যে বিভূতিযুক্ত, তা যিনি জানেন অর্থাৎ পরমাত্মা যে অব্যক্ত, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল যে যে অলৌকিক গুণধর্মযুক্ত, তা যিনি জানেন, তিনি আমাতে স্থিত হন। অতএব তত্ত্ব—পরমতত্ত্বকে বলে, পাঁচ তত্ত্ব, পঁচিশতত্ত্বকে বলে না। প্রাপ্তির পর আত্মা সেই স্বরূপে স্থিত হয় এবং সেই সেই গুণধর্মে যুক্ত হয়।

ঈশ্বরের নিবাসস্থান সম্পর্কে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন! সেই ঈশ্বর সকল ভূতপ্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত; কিন্তু মায়ারূপ যন্ত্রে আরূঢ় হয়ে লোক ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে, সেইজন্য জানতে পারে না। অতএব অর্জুন! তুমি হৃদয়ে স্থিত সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও। এর থেকেও গোপনীয় রহস্য আরও আছে যে, সর্বধর্মের চিন্তাত্যাগ করে তুমি আমার শরণাগত হও। তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে। এই রহস্য অনাধিকারীকে বলা উচিত নয়। যে ভক্ত নয় তাকেও বলা উচিত নয়; কিন্তু ভক্তকে অবশ্য বলা উচিত। তার কাছে গোপন করা উচিত নয়, না হলে তার কল্যাণ কিভাবে সম্ভব? অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, অর্জুন! আমি যা বললাম, তা তুমি উত্তমরূপে শুনেছ-বুঝেছ, তোমার মোহ নষ্ট হয়েছে কি? অর্জুন বললেন—ভগবন্! আমার মোহ নষ্ট হয়েছে। আমি স্মৃতিলাভ করেছি। আপনি যা বলছেন তা-ই সত্য, এখন আমি তা-ই করব।

সঞ্জয়, যিনি উত্তমরূপে উভয়ের কথোপকথন শুনেছিলেন নির্ণয় করে বললেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হলেন মহাযোগেশ্বর ও অর্জুন হলেন মহাত্মা। তাঁদের কথোপকথন বার বার স্মরণ করে তিনি আনন্দিত হচ্ছেন। অতএব কথোপকথন স্মরণ করা উচিত। হরির রূপ স্মরণ করেও তিনি বার বার আনন্দিত হচ্ছেন। অতএব বার বার স্বরূপের স্মরণ করা উচিত। ধ্যান করা উচিত। যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও যে পক্ষে মহাত্মা অর্জুন। সেই পক্ষেই শ্রীঃ, বিজয়-বিভূতি ও ধ্রুবনীতি। সৃষ্টির নীতি আজ যেমন, কাল তেমন থাকবে না। ধ্রুব একমাত্র পরমাত্মা। তাতে প্রবেশ প্রদান করে যে ধ্রুবনীতি, তা-ও সেই এক। যদি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে দ্বাপরযুগের ব্যক্তি বলে চিন্তা করা হয়, তবে তো আজ না কৃষ্ণ আছেন, না আছেন অর্জুন! বিজয়-বিভূতি কি তাহলে লাভ করা সম্ভব নয়? তাহলে গীতাশাস্ত্রের উপযোগিতা কি আমাদের কাছে? কিন্তু না, শ্রীকৃষ্ণ যোগী ছিলেন। অনুরাগপূরিত হৃদয় যে মহাত্মার, তিনিই অর্জুন। তাঁরা সর্বদা আছেন এবং থাকবেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি অব্যক্ত, কিন্তু যেভাব আশ্রয় করেছি, সেই ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বাস করেন। তিনি সদা ছিলেন ও সদাই থাকবেন। সকলকে তাঁর শরণাগত হতে হবে। যিনি শরণাগত, তিনি মহাত্মা, অনুরাগী এবং অনুরাগকেই অর্জুন বলা হয়। কল্যাণের জন্য কোন স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের শরণাগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কারণ তিনিই একমাত্র প্রেরক।

বর্তমান অধ্যায়ে সন্ন্যাসের স্বরূপ স্পষ্ট করা হয়েছে, সর্বস্বের ন্যাসকেই সন্ন্যাস বলে। কেবল কৌপীন ধারণ সন্ন্যাস নয়; বরং এর সঙ্গে নির্জনে বাস ও নির্ধারিত কর্মে সামর্থ্য অনুসারে অথবা সমর্পণ করে নিরন্তর প্রযত্ন করা অপরিহার্য। প্রাপ্তির পর সর্বকর্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে, সন্ন্যাস ও মোক্ষ একই পর্যায়। এটাই সন্ন্যাসের পরাকাষ্ঠা। অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'সন্ন্যাসযোগো' নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।। ১৮।।

এই প্রকার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে 'সন্ন্যাসযোগ' নামক অষ্টাদশ অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামীঅড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ ‘যথার্থগীতা’ ভাষ্যে ‘সন্ন্যাসযোগো’ নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।।১৮।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামীঅড়গড়ানন্দকৃত ‘শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা’র ভাষ্য ‘যথার্থ গীতা’তে ‘সন্ন্যাসযোগ’ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।